উদ্বাস্তুর গান

দীপ্তাস্য যশ

৯০ লেখকের কথা ০৫

ছোটোবেলা থেকে বাঙাল আর শহিদের মিল সংক্রান্ত জোক্সটি শোনেনি এমন বাঙালি বোধহয় খুব কমই আছে। কিন্তু খুব কম-জনাই বোধহয় এই জোক্সের হাসির অন্তরে যে বুকফাটা হাহাকার আছে তা উপলব্ধি করেন বলার সময়।

এই হাহাকার, তার উৎপত্তিস্থল বুঝতে গেলে বোধহয় একটু পিছিয়ে যেতে হবে। একটু খুঁড়ে দেখতে শিকড়। যেতে হবে একটু গোড়ায়। তবেই হয়তো উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বাঙালির বুকফাটা হাহাকারের উৎস।

যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলার মধ্যে মিল কোথায়; সমস্বরে সবাই উত্তর দেবেন আমাদের ভাষা এক, বাংলাভাষা। আমরা সবাই বাংলাভাষী।

এবার যদি প্রশ্ন করি, বলুন তো, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুর মধ্যে অমিল কোথায়?

একটু থমকে গেলেন তো। ভাবছেন এ আবার কীরকম প্রশ্ন? সংখ্যালঘু— এটাই তো একটা মিল। এটা আবার প্রশ্ন করে জানার কী আছে!

বেশ কয়েকটা শুষ্ক তথ্য, পরিসংখ্যান তুলে ধরি আপনার সামনে।

১৯৫১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ছিল হিন্দু

জনসংখ্যা। ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭.৯ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন তারা বলেন বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে যা অত্যাচার করেছে তা করেছে উর্দুভাষী পাকিস্তানিরা। বাকি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জনসংখ্যার কথা না তোলাই ভালো। কমতে কমতে তা আজ সে-দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখুন, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ষোলো শতাংশ, বর্তমানেও ৩০ শতাংশের কিছু বেশি। একইভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ১৯৫১ সালে ৯.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে আজ প্রায় পনেরো শতাংশ। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার বজায় আছে।

কী, এবার অমিল খুঁজে পাওয়া গেল কিছু? নাকি এখনও আপনার কানের কাছে বাজছে একদল সুবিধাবাদীর ডায়লগ, "সংখ্যালঘুরা দুই দেশেই অত্যাচারিত"?

এরাই এককালে আমাদের বোঝাতেন, বাংলাদেশের, থুড়ি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তা সবই উর্দুভাষী পাকিস্তানিদের হাতে। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের অপার সম্প্রীতি বিরাজ করছে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব একটু ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯৭৪ সাল থেকে এযাবৎ বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমে তা এখন ৭.৯ শতাংশ।

এই অপার শান্তির কাহিনিটি প্রথম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় তসলিমা নাসরিনের লেখায়। দেখা যায় যে শুধুই উর্দুভাষী পাকিস্তানিরা নয়, বাংলাভাষী বাংলাদেশিরাও হিন্দুদের উপরে অত্যাচারে একই রকম সিদ্ধহস্ত।

সত্যি প্রকাশের দাম তসলিমাকে যথেষ্ট চোকাতে হয়েছে। দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি ভাষার টানে পশ্চিমবাংলায় থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তথাকথিত "বাঙালির অভিভাবকরা" নিজেদের বিষাক্ত দাঁত, নখ বার করে তার উপরে আক্রমণ করে বাধ্য করেছেন বাংলার মাটি ছাড়তে। "সংস্কৃতিবান", "রুচিশীল" কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছে তসলিমাকে বাংলার মাটি-ছাড়া করার জন্য।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, একজন তসলিমাকে নিয়ে এত হাঙ্গামা কেন?

কিছুদিন আগে বর্তমান সময়ের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের একটি উপন্যাস পড়ছিলাম। বিষয়, উদ্বাস্তু দুই মানুষের শেষবয়সের কাহিনি এবং তাদের বর্তমান প্রজন্মের কথা। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের বর্ণনার সময়ে লেখা হয়েছে, "পাঞ্জাব থেকে আসা হানাদারেরা দাপাতে লাগল পদ্মানদীর পাড়ে"। খুবই বিনীত প্রশ্ন করা যায় এক্ষেত্রে, গোলাম সারওয়ার কি পাঞ্জাব থেকে এসেছিল? নোয়াখালির দাঙ্গা কি উর্দুভাষী পাকিস্তানিরা করেছিল?

এই যে ভণ্ডামি, এটাই এখন সেকুলারিজ্মের আধুনিক বাংলা মানে। এখানে সেকুলারিজ্ম মানে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, সেকুলারিজ্ম মানে হল ধর্ম বেছে বেছে মতামত দেওয়া। এরাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের নিন্দা না করলেও যখন প্রসঙ্গ একেবারেই এড়াতে পারে না, তখন বলে, "দুই দেশেই সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত"।

এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তথ্য অনেক সহজলভ্য, ঘটনার বিবরণ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। তাই আমরা দেখতে পাই কীভাবে বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবে বাংলাদেশের হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। কীভাবে প্রতিনিয়ত মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কীভাবে প্রতিদিন তারা দেশের মধ্যে থেকেও দেশহারা হচ্ছেন।

অপরদিকে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতবর্ষের অবস্থা। মনে করুন সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের কথা, মনে করুন নূপুর শর্মা-বিরোধী আন্দোলনের কথা। মনে করুন নিকিতা তোমরের কথা, মনে করুন শ্রদ্ধার কথা। মনে করুন বসিরহাট, দেগঙ্গা, ধূলাগড়, কালিয়াচকের কথা।

আসলে কী জানেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনো সংখ্যালঘু নেই। এখানে আছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সহনাগরিকরা। অপরদিকে বাংলাদেশের চিত্র প্রতিদিন যা আমরা দেখছি তাতে যদি বলি সে-দেশের সংখ্যালঘুরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, তাহলে মনে হয় না অত্যুক্তি করা হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের দেশে বা বিশেষত আমাদের রাজ্যে সংখ্যালঘু না

থাকলেও কিছু সংখ্যাঘুঘু অবশ্যই আছেন। সেই সংখ্যাঘুঘুরা কারও কারও জন্য "দুধেল গোরু"। তেহট্টে সরস্বতী পুজো বন্ধ, দুর্গা পুজোর বিসর্জনের নির্ঘণ্ট পালনে বাধা সেরকমই এক-একটা লাথ। এদের দাবি, আমাদের সেই লাথ খেতে হবে। আর লাথ খেতে না-চাইলেই আমরা সাম্প্রদায়িক।

এই "সেকুলার সমাজসেবকরা" আমাদের বোঝাতে চান, এসবের পরেও আমাদের ভাষার টানে সব ভুলে যেতে হবে। বুকে জড়িয়ে নিতে হবে সবাইকে। ভাষার টান? কীরকম ভাষা? একটু উদাহরণ দিই—

"ফজরে উঠিয়া আমি দিলেদিলে কই,
হররোজ আমি যেন শরিফ হইয়া রই।
মুরুব্বিগন যাহা দেন ফরমান,
খিদমত করি তার করি সম্মান।"

বলুন তো, এর মধ্যে বাংলা কোথায়?

এগুলো নাকি আমাদের মেনে নিতে হবে, তাহলে নাকি আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে, আজ বহু বাঙালি কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে যায়। সেখানে এই শব্দগুলি তারা বহুল ব্যবহার করেন। তাই আব্বা, আম্মা যেমন বহু "বাঙালি" বলেন, এই শব্দগুলোও বহু বাঙালি প্রতিনিয়ত বলতে বাধ্য হন। সেক্ষেত্রে এগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক আগ্রাসনের থিয়োরি না-দিয়ে। ভাষার সমৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন কোনো নির্দিষ্ট শব্দ আমার ভাষায় নেই, তাকে আমি অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করি। যেমন চেয়ার, টেবিল, কাপ, প্লেট ইত্যাদি। এবার যে শব্দগুলিকে ঢোকাতে চাওয়া হচ্ছে তা কি আমাদের শব্দকোষে নেই? আছে। তাকে জোর করে পালটে দিতে চাওয়া হচ্ছে। এই পালটে দেওয়াই আগ্রাসন।

প্রথম আগ্রাসন হল হিন্দুদের সে-দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে নগণ্য হয়ে যাওয়া। এই আগ্রাসনের পরের ধাপ হল, অনুপ্রবেশ। সেই অনুপ্রবেশকেই স্বাভাবিকতা দেওয়ার জন্য এই ভাষার আগ্রাসন। যাতে সাধারণ মানুষের অস্বাভাবিক না লাগে।

ভাষা একটি মিল বটে। কিন্তু ঘৃণা-ভরে বলি উর্দু অনুসরণকারী, নিজেকে

খাঁটি প্রমাণ করতে চাওয়ার তাগিদে বলা এই খিচুড়ি আমার ভাষা নয়। এ আমার বাংলা নয়। আমার বাংলা হল যা বীরভূমের রাঙামাটিতে বলা হয়, আমার বাংলা যা পুরুলিয়ার পাথুরে জঙ্গলে বলা হয়, আমার বাংলা যা আজ থেকে মাত্র ৭৫ বছর আগে চট্টগ্রামের বলা হত, নোয়াখালি বা বড়িশালে বলা হত।

কথার মধ্যে শুধুমাত্র কিছু করি, খাই, যাই জুড়ে দিলেই তা বাংলা হয়ে যায় না। তাহলে "আমি তোমাকে ভালোবাসে", একেও বাংলা বলে মান্যতা দিন।

বাঙালি হল সে-ই, যার বাড়িতে ধানের মড়াইতে মঙ্গলচিহ্ন আঁকা থাকে। বাঙালি সে নয়, যে প্রতিবেশী হিন্দুটির জমি দখল করে নেওয়ার জন্য ধর্ম অবমাননার অছিলায় তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। বাঙালি হল সে, যে দুর্গা পুজোয় শত কাজ ফেলে নিজের শিকড়ে ফেরে। বাঙালি সে নয়, যে অষ্টমীতেই দুর্গা মূর্তি ভাঙায় মত্ত হয়ে ওঠে। বাঙালি হল সে, সরস্বতী পুজোয় হলুদ শাড়ি অথবা পাঞ্জাবি পরে অঞ্জলি দিতে যাবে। বাঙালি সে নয়, যে ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে সরস্বতী পুজো বন্ধের জন্য হাঙ্গামা খাড়া করবে।

ফজরে উঠিয়া, গোসল করিয়া, নাস্তা করিয়া, আপার বাড়িতে দাওয়াতে খেতে যাওয়ার মধ্যে নকলনবিশি থাকতে পারে, কিন্তু বাঙালিয়ানা নেই।

একে এক করতে চাওয়ার মধ্যে অত্যাচারীকে আড়াল করতে চাওয়ার ভণ্ডামি থাকতে পারে, কিন্তু সততা নেই।

বাঙালির একটা তুলসী মঞ্চ থাকবে, সন্ধের শাঁখ থাকবে, লাল পাড় সাদা শাড়ি থাকবে, শিবরাত্রির দিনের স্নিগ্ধ সাজ থাকবে, তুসু, ভাদু থাকবে। ইতুর পুজো থাকবে। এগুলো বাঙালির ধর্ম নয় শুধুমাত্র, এগুলো বাঙালির ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার। এ বাদ দিয়ে বাঙালি হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। বাঙালির সন্তান থাকবে দুধে-ভাতে, গোস্ত বিরিয়ানিতে নয়।

এই ঐতিহ্য, উত্তরাধিকারকে রক্ষা করতে চাওয়ার জন্য যাঁরা দেশ ছেড়েছেন, তাঁরা আমার মানুষ। আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাঁদের দেশ দেওয়া।

একসময় বামেরা বাংলাদেশের বিঘার পর বিঘা জমি, সমুদ্রের সমান পুকুর, এসব খুব লিখত সাহিত্যের নামে। এমন এক প্রাচুর্যের ছবি দেখানো হত যা একেবারেই অবাস্তব। ফলে সে নিয়ে হাসাহাসির অন্ত ছিল না। কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে রাখা তো সেই হতদরিদ্র মানুষগুলোর কথা, যাদের জমিজমা কিছুই ছিল না, কিন্তু তারাও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল শুধুমাত্র তারা নিজেদের ধর্ম ছাড়তে রাজি হয়নি বলে, নিজের ঘরের মেয়েটার মান-সম্ভ্রম লুটিয়ে দিতে রাজি হয়নি বলে। এদের নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, কিন্তু এদের অধিকারের কথা কেউ বলেনি। কেউ বলেনি ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে শুধুমাত্র সেদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য। সেদেশের সংখ্যালঘুরা এখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পায়নি, তারা এখনও পূর্ব পাকিস্তানেই রয়েছে। সেখান থেকে অত্যাচারিত হয়ে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে, শিকড় ছিঁড়ে এসে হাজির হচ্ছে আমার উঠোনে। আমার দেশের মাটিতে। এরা আসলে আমাদের দেশহীন দেশবাসী। নাগরিকত্বহীন সহনাগরিক আমাদের। তাই এদের অধিকার সুনিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। এদের মাটি দেওয়া, এদের উত্তর-প্রজন্মকে শিকড় দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। ভাষা নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরাই ভ্রাতৃত্বের শিকড়। এগুলোই মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। ভাষার কথাই যদি বলা হয়, তাহলে তো যারা এদের দেশ-ছাড়া করেছে তারাও "মালাউনের বাচ্চা দেশ ছেড়ে চলে যা" বলেই তাড়িয়েছে। শহিদের সঙ্গে বাঙালের তুলনা করে জোক্স বানানো হয়, কিন্তু মনে করুন গনেশ ঘোষ, লীলা রায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী— যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের সবটুকু উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁরা দেশের জন্য কালাপানি পার করে সেলুলার জেলে মনুষ্যতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন— তাঁরাও কিন্তু একইভাবে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছেন "বাঙাল" পরিচয়ে।

ভাষা নয়, আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধই আমাদের সংযুক্ত করে। তাই আজ আমরা এদের নাগরিকত্বের দাবিকে সমর্থন না-জানালে তা আমাদের অপরাধ হবে। আজ আমরা ভাষার উপরে এই আগ্রাসনকে মেনে নিলে কাল

একইভাবে আমাদের দেশের মধ্যেই দেশহীন হয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাই নিজের ভাষাকে ভালোবাসুন, কিন্তু আরও বেশি ভালোবাসুন নিজের সহনাগরিকটিকে। যিনি আপনার মতো একইভাবে বিশ্বাস করেন,

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে
বহুবলধারিণীং
নমামি তরিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্
বন্দে মাতরম্"

এই নাগরিকত্বহীন আমাদের সহনাগরিকদের কথা নিয়েই আমার বই উদ্বাস্তুর গান। যে গল্প শিয়ালদহ স্টেশানে নয়, শুরু হয়েছে পদ্মা মেঘনার

পাড়ে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবীর সে-দেশের সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের ঘটনাগুলিকে একত্রিত করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশিত করেন। আমার বইয়ের ক্ষেত্রেও আধার সেই শ্বেতপত্রটিই। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোনো ঘটনা তুলে ধরা হলেই আমাদের সেকুলাররা তাকে "প্রোপাগান্ডা" বলে ধামাচাপা দিতে চান। সেই কারণেই আমার বইতে বেশ কয়েকটি গল্পের সঙ্গে তথ্যসূত্র হিসাবে সত্যি ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছি। এর বাইরেও কয়েকটি গল্প আছে যেগুলির কোনো তথ্যসূত্র নেই, কিন্তু আমার মনে হয় না বাঙালির স্মৃতিশক্তি এতটাও দুর্বল হয়ে গেছে যে তারা দেশভাগ এবং সেই সময়ের অত্যাচারের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে।

গল্পগুলির বিষয় যদিও এক, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচারের কাহিনি, তাও যাতে পাঠকের একঘেয়েমি না আসে তাই চেষ্টা করেছি আলাদা আলাদা আঙ্গিকে এবং আলাদা আলাদা মেজাজের গল্প লিখতে। এরকমই কয়েকটি ছোটো গল্প নিয়ে এই সংকলন "উদ্বাস্তুর গান"—যা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে উদ্বাস্তুর আড়ালে থাকা মানুষটার আকুতিকে।

এই আমার নিবেদন। এবার বাকিটুকু আপনাদের বিচার। আপনারা এই বই পড়ে বা না-পড়ে এই সহনাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুভব করেন, নাকি মনে করেন সবই আসলে "ক্যাঃ ক্যাঃ ছিঃ ছিঃ"।

—দীপ্তাস্য যশ

৯৩ প্রাক্‌কথন ৩৫

উদ্বাস্তু সমস্যা, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রভৃতি নিয়ে যখন আলোচনা করি বা শুনি তখন ছোটোবেলার কিছু স্মৃতি মনে আসে। আমার যেখানে জন্ম ও বড়ো হওয়া, সেই মেদিনীপুর (এখন ওই অংশটি পশ্চিম মেদিনীপুর) জেলার খুবই প্রাচীন একটি জনপদ দাঁতন থেকে দুই-তিন কিলোমিটার পূর্বদিকে গেলেই একটি বিশাল দিঘি, নাম শরশঙ্ক। ভারতভাগ এবং স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বেশ কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার সেখানে ঠাঁই পায় সরকারের খাসজমিতে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তারা মিলেমিশেই থাকত। তবু কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম দেওয়াল ছিল। সেটা বোঝা যেত স্থানীয় মানুষ এবং উদ্বাস্তু উভয়েরই মনোভাবে। যা-ই হোক, ছোটোবেলায়, মানে '৭০-এর দশকে ওদের দু-একজনকে বাবার কাছে আসতে দেখতাম। এলেই অবধারিতভাবে প্রচুর গল্প হত বাবার সঙ্গে। উঠে আসত দেশভাগ, অত্যাচার, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ইতিহাস। শুনে মনে হত, মানুষ মানুষের উপর সত্যিই এমন অত্যাচার করতে পারে? তা-ও ধর্মের নামে?

এরপর ২০০৯ সালের একটি স্মৃতি। ১৯৬৪ সালে যে ভয়াবহ হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নানা জায়গায় হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই দাঙ্গায় সব হারিয়ে শুধু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে-

আসা একজন মানুষের (পরে বহু প্রতিকূলতা জয় করে তিনি একজন সফল চিকিৎসক হয়েছিলেন, বহুদিন দেশের বাইরেও ছিলেন।) আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাসের প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। লেখকের নাম ডা. মৃণালকান্তি দেবনাথ। বইয়ের নাম 'জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে'। বইটাতে চোখ বুলিয়ে অনেকেই লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন, বইতে যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে, বাস্তবে সেগুলো সত্যিই ঘটেছিল? লেখকের উত্তর ছিল, ঘটনা এর বহুগুণ বেশি ঘটেছিল। কিন্তু সে সব কিছু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই রেখেঢেকে লিখতে হল।

মানুষ কর্তৃক মানুষের জীবন, জীবিকা ধ্বংস করে তাকে দেশছাড়া করার ঘটনা নতুন নয়। মানব ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনার সংখ্যাই বেশি। আজকের দিনের সবচেয়ে উন্নত এবং সমৃদ্ধ সম্প্রদায় ইহুদিরা বারবার উদ্বাস্তু হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকেই শুরু হয় ইজরায়েল থেকে ইহুদিদের উৎখাতপর্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল এই প্রক্রিয়া। কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায় মুছে যায়নি। হারিয়ে যায়নি তাদের অস্তিত্ব। বহু শতাব্দীর উদ্বাস্তু জীবন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে নাতসিদের ইহুদি নিধন যজ্ঞ হলোকস্টের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ইহুদিরা আজ এক সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ জাতি। হাজার হাজার বছরের উদ্বাস্তু জীবনেও নষ্ট হয়নি তাদের জাতিসত্তা। জাতিগত চেতনা প্রবল শক্তিশালী না হলে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হওয়া কোনো জনগোষ্ঠী এইভাবে আবার একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

শক্তিশালী জাতিসত্তা ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করেছে। আর এই চেতনার অভাবই হয়তো বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের অনেক দুর্দশার কারণ ঘটিয়েছে। দুর্দশার এই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি আজও হয়নি। বিগত শতাব্দীর তিনের দশক থেকে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের উত্থান ঘটে। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে মুসলিম লিগের নির্বাচনি সাফল্য প্রমাণ করেছিল যে মুসলিমদের মধ্যে লিগের সমর্থন বাড়ছে। বাংলার পূর্বাংশে অ-মুসলিমদের, বিশেষত হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত সম্ভবত তখন

থেকেই।

এরপর মুসলিম লিগ যতই ক্ষমতার দিকে এগিয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশে অ-মুসলিমদের বিশেষত হিন্দুদের বিপদ বেড়েছে। অবশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার ঘটনা এর আগেও যথেষ্টই ঘটেছে। ১৯৩০ সালের জুন মাসে ঢাকায় এবং একই বছর মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে ঘটে-যাওয়া দাঙ্গা এর বড়ো উদাহরণ। ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবরের ভয়াবহ নোয়াখালি গণহত্যা (যার অসহায় শিকার ছিল হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দু।) ছিল, তার আগের দেড় দশকের ছোটোবড়ো অসংখ্য হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার এক চূড়ান্ত রূপ। আর নোয়াখালির দাঙ্গা কেবল অক্টোবরেই শেষ হয়ে যায়নি। চলেছিল ডিসেম্বর পর্যন্ত, ছড়িয়েছিল অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বাংলার পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমদিকে হিন্দুদের চলে আসার প্রবণতা তিনের দশক থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গার পর হিন্দুদের একটা বড়ো অংশই আর বাংলার পূর্বাংশকে নিরাপদ বলে মনে করেনি। দেশভাগের সিদ্ধান্ত তাদের আতঙ্ক আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেশভাগ অনিবার্য হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল উচ্চবর্গের হিন্দুরা অধিকাংশই বাংলার পশ্চিমাংশে চলে আসে। একটি অংশ চলে যায় ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ বাস্তুচ্যুতির ঘটনার এগুলি ছিল সূত্রপাত মাত্র।

ব্রিটিশ আমলে পশ্চিমি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা উচ্চবর্গের হিন্দুরা কৃষির বাইরে বিকল্প বৃত্তি গ্রহণ করে নিয়েছিল সহজভাবে। তাই তাদের একটা বড়ো অংশের দেশত্যাগ অন্তত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ ধরে হয়নি। কিন্তু জমির ওপর নির্ভরশীল হিন্দুরা, যাদের একটা বড়ো অংশই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের, তাদের সংকট ছিল স্পষ্টতই অনেক বেশি। তিনের দশক থেকে মুসলিম লিগের রাজনীতি, একের পর এক হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা ঘটলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে হাঁটতে অনেক হিন্দুই রাজি ছিল না। একদিকে ছিল বিকল্প জীবীকার অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে পূর্বপুরুষের জমির

প্রতি বহু প্রজন্ম ধরে লালিত মমত্ববোধ। দেশভাগের পরেও হিন্দুদের একটা অংশ তা-ই থেকে গেল পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে। বিশ্বাস রেখেছিল যোগেন মণ্ডলের মতো রাজনৈতিক নেতার মুসলিম দলিত ঐক্যের ভাবনায়। যোগেন মণ্ডলের প্রচারিত ভাবনা ছিল, উচ্চবর্ণ, বিশেষত ব্রাহ্মণরাই যত নষ্টের গোড়া। হিন্দু দলিত এবং মুসলিম উভয়েই তাদের হাতে অত্যাচারিত। তাই তাদের স্বার্থেরও কোনো বিরোধ নেই। তাই নিম্নবর্গের হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগেরও প্রয়োজন নেই। এ যেন রোগী যে পথ্য খোঁজে, ডাক্তার তারই নিদান দিল। কিন্তু ইতিহাস তো এত সরল পথে চলে না। যোগেন মণ্ডলের ওপর ইতিহাস খুব সদয় হয়নি। পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যপদ, আইনমন্ত্রীর পদ সবই ছেড়ে তাঁকে সেই ভারতেই পালিয়ে আসতে হয়। ১৯৪৯ সাল থেকেই শুরু হয় হিন্দুদের জমি, সম্পত্তি, জীবন, জীবিকা ও সম্মানের ওপর আক্রমণ। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহিতে এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। ক্রমেই ছড়ায় গোটা পূর্ব পাকিস্তানে। দেশভাগের পরেও যাঁরা পূর্বপুরুষের ভিটে ও জমি আগলে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবার তাঁদেরও উদ্বাস্তু হওয়ার পালা। ১৯৫০ সালের ২ এপ্রিল পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকের মতে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। ১৯৬৪ সালের ৩ জানুয়ারি খুলনায় হিন্দুদের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ হয়। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত হজরত মহম্মদের পবিত্র চুল চুরি গেছে—এই মিথ্যে গুজব রটিয়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। এই দাঙ্গা নিয়ে কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার (যিনি নিজে ১৯৫০-এ বরিশালের দাঙ্গায় সব হারিয়ে পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নেন।) গান বেঁধেছিলেন :

কাশ্মীরে হয়েছে চুরি
মহম্মদের চুল।
তা-ই নিয়ে পূর্ববঙ্গে